দিনেশ দাসের কবিতা

পাণ্ডুলিপি
৪৪ লেক অ্যাভিনিউ · কলিকাতা ২৯

এ যুগে হুজুগের হিড়িকে শুধু অঙ্গভঙ্গির বাহাদুরী দেখিয়ে সস্তায় নাম কেনবার প্রলোভন যে স্বল্প কয়জন জয় করেছেন, দিনেশ দাস শান্ত সমাহিত সেই স্বধর্মনিষ্ঠ কবিদের মধ্যেও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর অঙ্গও আছে, ভঙ্গিও। কিন্তু পরম সৌষ্ঠবের কঠিন শাসনে তা পরিমিত।

কবিতার প্রতি এ যুগের পাঠকসাধারণ যে বেশীর ভাগ বিমুখ, তার জন্যে তাঁদের খুব বেশী দোষ বোধহয় দেওয়া যায় না। বর্তমানকে প্রতিবিম্বিত করার নামে এ যুগের অধিকাংশ কবিতা বাক্‌চাতুর্যের অর্থহীন অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে। সেই নিষ্ফল আতিশয্যের অরণ্যে দিনেশ দাসের এক একটি কবিতা এক একটি বিস্তীর্ণ গভীর হ্রদের মত। জটিল আধুনিক মনের সমস্ত প্রশ্ন প্রেরণা ও প্রত্যাশা তার মধ্যে প্রতিফলিত, কিন্তু তার স্বচ্ছতা তবু কোথাও ক্ষুণ্ণ নয়। সাময়িক উত্তেজনা ও বাহ্যিক উচ্ছ্বাস থেকে সত্যিকার জাত-কবিতাকে যা আলাদা করে রাখে, সেই অতলতার ইঙ্গিত তার সর্বত্র বর্তমান।

৩.৭.৫১ প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রচ্ছদচিত্র শ্রীরামকিংকর

ভূমিকা

আধুনিক অনেক কবির মতো দিনেশ দাসের খ্যাতি ন' দিনের নয়, উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। খুব কম মনে পড়ে জনৈক কবির একটিমাত্র কবিতাকে কেন্দ্র করে অত বড়ো আন্দোলন যা একদা হয়েছিল "কাস্তে" নিয়ে। বড়ো ছোট সব কবিই; ভালো কবিতার তারিফ আগে আসে যাঁদের কাছ থেকে, প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। "কাস্তে"র ধার না থাকলে পুনরুল্লেখ প্রায় একটা ফ্যাশন্-এ দাঁড়িয়ে যেতো, রক্ষে এই, অনেকেই অনুসরণ দুর্বল হবে ভয়ে ক্ষান্ত দিয়েছিলেন। "কাস্তে" একটা ঘটনা বাঙলা কাব্যসাহিত্যে। সেই থেকে, দিনেশ দাস পাঠকদের আগ্রহ ধরে রেখেছেন এবং অসমানে নয়। চপ্‌চপে প্রেম, উচ্ছ্বসিত জাতীয়তাবোধ, রাজনৈতিক প্রচার অথবা অপপ্রচার, ধোঁয়াটে কথা ও উপমার ঠাণ্ডা ভেল্কি, এর কোনো একটারও সাহায্য না নিয়ে দিনেশ দাস নাম করেন এ বড়ো কম কথা নয়, এ দেশে, যখন এবং যেখানকার আকাশ জুড়ে যিনি ছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ সত্ত্বগত আর শুধু সেই একটি আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের অভাবে হঠাৎ সর্বস্বান্ত সাহিত্য-জগতে কেউ রইলেন না, আজও পর্যন্ত না, যাঁর প্রশংসা বা আলোচনার জন্যে উন্মুখতা আসে, লাভ করলে মাথা উঁচু করা যায় আরো আরো উঁচু করার জন্যে সুস্মুখ সুস্বাস্থ্য চারাগাছের মতো। এক দিক থেকে সৌভাগ্য, এই মাঝারির ভীড়ে দেবার কেউ নেই বলে পুষ্টিকর উৎসাহ অন্য নামে প্রশংসাপত্র কেউ চায় না, তাই স্বপক্ষে বা বিপক্ষে সজোরে আলোচনা চলে, উপরের রায়ে হঠাৎ মুখ বন্ধ করতে হয় না। দিনেশ দাস বহু আলোচিত কবি নন, শুদ্ধ প্রশংসিত।

কোনো "বাদ-"এ আটক পড়েন নি বলে দিনেশ দাস মুক্ত ও অবিকৃত রাখতে পেরেছেন তাঁর মন, এই ভয়ানক হট্টগোলের যুগে, যখন ঘটনাকে তার নিছক সত্যস্বরূপে দেখা প্রায় দুশ্চর তপস্যাসাধ্য। আর তাই, ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ষোলো বছরের অবিস্মরণীয় মর্মান্তিক ইতিহাসের ঘটনাগুলির উপর আশ্চর্য-ভালো কবিতা লেখা তাঁরই পক্ষে সম্ভব হয়েছে, ঘটনাকে ছাপিয়ে যা কাব্যলোকের স্থির সৌন্দর্য-

লক্ষ্যে পৌঁচেছে। রাজনৈতিক দাবাখেলার বোবা বোকা ছন্নছাড়া মানুষগুলির করুণ টানাপোড়েন (শুভ্র ভোর), ব্যর্থ পূর্ণ-স্বাধীনতা (পনেরোই অগস্ট, ১৯৪৭), গান্ধীর অপঘাত মৃত্যু (শেষ ক্ষমা, স্বর্ণভস্ম), প্রাচ্য বর্বরতায় নেশাগ্রস্ত সাম্প্রদায়িকতার পাপের প্রায়শ্চিত্তে সেই মহা-পুরুষের নোয়াখালি পরিক্রমা (পুনর্জন্ম), নিখুঁত পরিকল্পনানুযায়ী বিনা রক্তপাতে সুশৃঙ্খল লক্ষ লক্ষ হত্যা (ভূখ-মিছিল, ১৩৫০), ধানচাল নিয়ে বণিকের জালিয়াতি (ইস্পাহান), ভারত-ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২), দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (যুদ্ধ) এবং সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান (সাইগন-বার্লিন, এই সঙ্কলনে স্থানাভাব ঘটেছে)—কিছুই তাঁর কাব্যে বাদ পড়ে নি। ভাবালোকের কুয়াশায় নিরুপদ্রব আশ্রয় নিয়ে তিনি পরাজিত ও পলাতকের মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেন নি কদাচ। অথচ, ভবিষ্যদ্রষ্টা উপদেষ্টা এবং অবশেষে 'ঈশ্বর মঙ্গলময়' বলার প্রলোভনকে জয় করেছেন।

সত্যেন দত্তর মতো এবং জীবনানন্দ দাশের মতো নয়, দিনেশ দাসের কবিতা সরবে পড়বার কবিতা।—ধ্বনিতে, সঙ্গীতে অনবদ্য। পরিমিত শব্দসংগ্রহের শক্তি নিয়েও তিনি ছন্দে, মিলে বিস্ময়কর সার্থকতা পেয়েছেন। তাঁর কবিতায় বর্ণসমারোহ যদি নাই থেকে থাকে, সে অভাব তিনি দ্বিগুণ করে পূরণ করেছেন ধ্বনিসমন্বয়ে— এ বিষয়ে তাঁর সচেতনতা সর্বদা উৎসুক।

বহুভাষিতাদোষমুক্ত বর্তমান কবির ভৌগোলিক নামপ্রীতি অসাব-ধানীরও শ্রুতি এড়িয়ে যায় না। নাম-বিশেষ্যের এই সুষ্ঠু ব্যবহার তাঁর কবিতায় পূর্ণতা এনে দিয়েছে অনেক সংক্ষেপে, অযথা কথা ও উপমার দীর্ঘ সিঁড়ি ভাঙার ক্লেশ পাঠককে স্বীকার করতে হয় না বক্তব্যে বা অর্থোপলব্ধিতে পৌঁছুতে।—

> ভস্ম তোমার ছড়িয়ে দিলেম
> গঙ্গা সিন্ধু খরস্রোতে—
> নীল, অ্যামাজন, হোয়াংহোতে

বা

> তুমি বলেছিলে খালি
> দিল্লী নয় চলো নোয়াখালি

বা

পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থ হতে বেথেলেম
কত না প্রাণের মরু পেরিয়ে এলেম

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগায় না কবির ভ্রমণের বা নিজের জ্ঞানের পরিসর কত বিস্তৃত বা সীমাবদ্ধ, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে অর্থ হয়তো বা নাগালের বাইরে ছিলো তা যেন হঠাৎ স্পর্শের মধ্যে এলো এই অনুভূতিই গাঢ় হয়ে ওঠে।

দিনেশ দাস পরীক্ষামূলক কোনো কিছু দুঃসাহসিক লেখার ঝোঁক সহজ হবার পরিচ্ছন্ন চেষ্টায় সফল হয়ে সামলাতে পেরেছেন, যেমন তিনি পেরেছেন দেহজ উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত করতে তাঁর কবিতায় (এত কম যে অনেক সময় অভাব বলেই মনে হয়)। এদিকে কিন্তু, তাঁর মন 'মৌমাছি' 'নখ' 'হাই' ইত্যাদি নির্ভেজাল লিরিক কবিতা সৃষ্টি করেও চাঁদকুনো নয়— সান্‌গ্লাস্ চোখে তিনি দেখেন না এই পৃথিবীকে যেখানে যত সবুজ মাঠ আছে তত লেজার (ledger) পাতাও আছে বোধ হয়।

কবির অত্যন্ত কাছাকাছি আছি বলে, তিনি এখনও পুরোদমে লিখছেন এবং আগামী অনেকদিন লিখবেন, এ প্রতিশ্রুতি তাঁর মধ্যে আছে, তাঁর কাব্য বিচার কিছু শক্ত। তবে, নিঃসন্দেহে, বর্তমানের অতি মুষ্টিমেয় সুকবিদের মধ্যে তাঁর স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই বইয়ে ছত্রিশটি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে, আরো এতগুলি যোগ করা নিতান্ত অর্থনৈতিক কারণে, ইচ্ছে সত্ত্বেও, সম্ভব হলো না। সাজানোটা, হাল আমল থেকে সাবেকে, প্রথমে একটু অস্বাভাবিক ঠেকতে পারে। কিন্তু এই রকমই হওয়া উচিত। বই খুলেই কবি-জীবন আরম্ভের কতকগুলি অপরিণত লেখা, যা স্বয়ং কবিই অস্বীকার করতে পারলে খুশি হন, (রবীন্দ্রনাথও অপ্রসন্ন ছিলেন 'সঞ্চয়িতা'র গোড়ার কবিতাগুলি সম্বন্ধে) পড়ে তারপর কবে, কি ভাবে ও কি করে তাঁর মানসিক ক্রমবিকাশ ঘটলো, রসপিপাসু মনের কাছে কবিতা পাঠের সময় এই অনুসন্ধিৎসা একেবারেই অবান্তর।

এই বই প্রকাশে আমাকে নানাভাবে আন্তরিক সাহায্য করেছেন 'দেশ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক বন্ধু শ্রীসাগরময় ঘোষ। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

মলাটের শেষপৃষ্ঠায় শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর চিত্রটি ব্যবহার করতে পেরে গৌরব বোধ করছি।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীরামকিংকর ও শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত।

সব কবিতাগুলি ইতিপূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত।

শিবদাস চট্টোপাধ্যায়

১৯৫১ — ১৯৪৬

ভারতবর্ষ

চোখভরা জল আর বুকভরা অভিমান নিয়ে
কোলের ছেলের মত তোমার কোলেই
ঘুরেফিরে আসি বারবার,
হে ভারত, জননী আমার !

তোমার উৎসুক ডালে
কখন ফুটেছি কচিপাতার আড়ালে,
আমার কস্তুরী-রেণু উড়ে গেছে কত পথে
দিগন্তে আকাশে ছায়াপথে,
তবুও আমার ছায়া পড়েছে তোমার বুকে কত শত ছলে
তুমি বাঁকা ঝিরঝিরে নদী ছলছলে
বাজাও স্নেহের ঝুমঝুমি,
জননী জন্মভূমি তুমি !

তোমার আকাশে আমি প্রথম ভোরের
পেয়েছি আলোর সাড়া,
দপদপে হীরে-শুকতারা
অস্ফুট কাকলি
জলে ফোটে হীরকের কলি
মধ্যাহ্নে হীরের রোদ—
হে ভারত, হীরক-ভারত !

কোন্ এক ঢেউছোঁয়া দিনে
বঙ্গোপসাগর থেকে পথ চিনে চিনে

কখন এসেছি আমি ঝিনুকের মত,
তোমার ঘাসের হ্রদে ঝিলের সবুজে
খেলা করি একা অবিরত !

আমি তো রেখেছি মুখ
তোমার গঙ্গোত্রী-স্তনে অধীর উন্মুখ,
মিটাল আগ্নেয় ক্ষুধা তোমার অক্ষয়বটফলে
দিনান্তে সুডৌল জানু মালাবার করোমণ্ডলে
দিয়েছ আমাকে কোল,
কত জলতরঙ্গের রাত্রি উতরোল
ভরে দিলে ঘুমের কাজলে,
মিশে গেছি শিকড়ের তন্ময়তা নিয়ে
তোমার মাটির নাড়ি হাওয়া আর জলে
গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত শরৎ —
হে ভারত, হীরক-ভারত !

আজ গৌরীশঙ্করের শিখরে শিখরে
জমে কালো মেঘ,
বৈশাখী পাখির ডানা ছড়ায় উদ্বেগ :
তবু এই আকাশসমুদ্র থেকে কাল
লাফ দেবে একমুঠো হীরের সকাল
চক্‌চকে মাছের মতন —
হে ভারত, হীরক-ভারত পুরাতন !

ছায়াপাহাড়

স্তব্ধ ভূগোল। কলকারখানা ক্ষেতখামার।
কলের পাথরে লাঙলের ফালে গুঁড়োনো হাড়।
মাঝখানে শুধু শিং উঁচু ক'রে রাত্রিদিন
দম্ভের কালো ছায়াপাহাড়
সীমানাহীন।

জীবন-জলের কল্লোল ওঠে কলস্বরে,
হৃদ্‌পিণ্ডের ঝুপ্‌ঝুপে দাঁড় এখনো পড়ে
ছলাৎ ছল,
প্রদীপের ভিজে শিখার মতই হৃদয় ঝরে
অচঞ্চল,
দুর্নিবার।
মাঝখানে শুধু ছায়াপাহাড়।

বাত-নিশীথ।
বালুঝড় ওড়ে। ঢেউ ভাঙেচোরে। পুরোনো ভিত
টলমল করে। লোনাজল ঢোকে নতুন খাতে,
ভিতের শিকড় কুরে-কুরে খায় ফেনার দাঁতে :
তবু অসাড়
মাঝখানে কাঁপা ছায়াপাহাড়।

ছায়াপাহাড়ের কালো ছায়া পড়ে অহর্নিশ
ঢাকে দূর-মাঠ দূরান্তের,

তারই নীচে আজো গম পাকে, জাগে ধানের শিষ
হেমন্তের :
হৃদয় এখনো পাখা ঝাপ্‌টায়, জীবন এখনো মানেনি হার —
ধোঁয়ার মতই ফুলে ওঠে শুধু দম্ভের কালো ছায়াপাহাড়।

ঘুঘু ডাকে

সকালের আলো-আলো হলুদ রোদ্দুরে
উড়ো এক ঘুঘু ডাকে দূরে
একটানা ডেকে ডেকে সারা
কানের পাতায় পড়ে
শিশির-ফোঁটার মত টুপ্‌টাপ্‌ সুরের ফোয়ারা
অজস্র পাপড়ি যেন ঝরে মাঠময়,
আজো কি আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয় ?

ঘুঘু ডাকে :
জলের মতই টানা ঝক্‌ঝকে সুরে
জলের মতই ঘুরে ঘুরে
একটি করুণ বৃত্ত আঁকে :
সেই বৃত্ত গোল হয়ে
আমার শরীর মন ঢেকে দেয় মূক সমারোহে
আলো-নীল হ্রদের মতন,
আমার শরীর-মন
রেষারেষি করেনাকো পুরোনো বিরোধে
হাত ধরাধরি ক'রে
নেমে আসে সকালের ভোর-কচি-কলাপাতা রোদে।

শহরতলীর শিরা বেয়ে বেয়ে স্টেট-বাস চ'লে গেল ধুঁকে
কখনো বাঘের মত কখনো সাপের মত ফুঁসে,

উপরে একটি ঘুঘু সবে-পাড়া-নরম-ডিমের মত বুকে
জীবনের হাওয়া টানে,
হাওয়া আনে শহরের মৃত ফুসফুসে।

এখানেও ভোর হয়?
শহরে পেলাম আজ ভোরের আস্বাদ
শহরেও নামে দেখি ঈশ্বরের স্থির আশীর্বাদ,
পৃথিবী আশ্চর্য মনে হয়
পৃথিবী আচম্‌কা মনে হয়॥

বৃষ্টি পড়ে

বৃষ্টি পড়ে
মেঘলা আকাশ চুঁয়ে
মেঘলা সময় ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

বৃষ্টি পড়ে
মাঠের উপরে
পোকা কেঁচো উইচিংড়ে শামুক
মাটি কুরে-কুরে-নামা বন্ধ রেখে উঁচু করে মুখ
নতুন ঘাসের মত উঠে আসে মাটির উপরে।

জোরে বৃষ্টি এল
ছোট ছোট জুঁইপাতা দোলে এলোমেলো
নারিকেল পাতাগুলি নড়া শুরু করে :
পাতা বেয়ে ডাল বেয়ে ঝরে
শুভ্র স্ফটিক জল
অবিরল।

জলের ঝাপটায়
পথঘাট ডুবে যায়,
রাজপথে হাইড্রেনে পিচের খোদলে
খল্‌খলে জলগুলি মাছের মতই ছুটে চলে।

আমি মৃতবৎ
একটানা শুনি শুধু বৃষ্টির ন'বৎ

ব্যাং পোকা পতঙ্গের ডাকে
সৃষ্টির নতুন মহরৎ।

বৃষ্টি পড়ে
থোকা থোকা সাদা জুঁই ফুটন্ত খ'য়ের মত ঝরে,
আমার জীবন যেন
জীবনের দিনগুলি অকারণে ফুল হ'য়ে ঝ'রে যায়
ব্যর্থতায় — শূন্যতায়!

শুভ্রভোর

আকাশ এখন আর দেয় না শিশির
মুঠো মুঠো ঝক্‌ঝকে প্রাণ,
জীবনের আশ্চর্য সবুজে
এ-মাটি হয় না মহীয়ান।

এখন আকাশ হ'তে মাটির উপরে
সারাদিন ঝরে রক্তরোদ,
আমার ধমনী যেন চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে
আকাশে মাটিতে আজ কিসের বিরোধ !

সময় নিথর
নীচে শুধু ধু-ধু করে মরুভূমি 'থর'
লোলুপ মধ্যাহ্ন লু-তে
সারাবেলা হা-হা করে পিঙ্গল বালুতে।

হে আকাশ
সহে না জীবন নিয়ে ক্রূর পরিহাস,
আর কতকাল
এনে দেবে সারি-সারি করুণ কঙ্কাল ?

তেরশো সাতান্ন এল
তবু আসে পঞ্চাশের হাওয়া এলোমেলো
গঞ্জে গ্রামে ছায়ার মিছিল
এদের জীবনে ছিল ঘাস-মাটি-শিশিরের মিল,
ফসলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে নদীর তুফানে
এদের জীবন ছিল — জীবনের ছিল এক মানে !

ছাই-ছাই সন্ধ্যার ছায়ায়
বেদুইন দিনগুলি একে-একে তাঁবু ফেলে মধ্য-এসিয়ায় :
তবু এরা পথ হাঁটে, হেঁটে হেঁটে কতদূরে যাবে
বাংলা আসাম পাঞ্জাবে
কোথায় পথের শেষ — কোন সায়াহ্নেই ?
শেষ নেই :

শেষ নেই :
ভারত সীমান্ত পারে আমলকী আখরোট বনের কিনারে
অনেক বালির ঢিপি পার হ'য়ে
খর্জুর-শ্রেণীর ধারে ধারে,
কারা যায় দলে দলে অন্ধকার ঠেলে
আরবে ইজ্রেলে
নীড়হীন
এসিয়ার নব-বেদুইন।

কষকালো রাত :
হে পৃথিবী, চোখ খোলো, খোলো আঁখি-পক্ষ্মের করাত,
অন্ধকার যাবে চিরে চিরে,
দেখা যাবে স্তিমিত তিমিরে
মাটির কোমল পথ আকাশগঙ্গার মত বয় ঝিরঝিরে :
পৃথিবী আবার হও আলোকের তপস্যা-বিভোর —
ওপার-আকাশে কাঁপে শুচিশুভ্র শিশিরের ভোর !

দেউলপুর

এতক্ষণে ক'লকাতার আকাশ-খিলানে
সন্ধ্যা-বউ গলায় ধোঁয়ার ফাঁস বেঁধে ঝুলে পড়ে,
ধূমল শাড়ির প্রান্ত দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠে গ্যাসের উপরে
বীভৎস করুণ মৃত্যু আনে।

এখানে দেউলপুরে পাঁশ-কালো শেয়ালের মত ঠিক
অন্ধকার নড়ে চড়ে, উঁকি মারে আনাচে কানাচে,
লোমশ শরীর তুলে জ্বলজ্বলে চোখ চেয়ে আছে
প্রাণের প্রতীক্।

ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরে-ফেরা পানকৌড়ির সারি ধূসর পালকে
থোবা থোবা অন্ধকার ব'য়ে ব'য়ে নিয়ে এল
মুছে দিয়ে শেষ সোনা-রোদ,
উদাস করুণ স্বরে ধুয়ে দিল পৃথিবীর সকল বিরোধ
প্রাণের প্রতিমা গড়ে অদেহী আকাশ হ'তে বিলুপ্তির লোকে

এখানে কাঁটায় গুল্মে কাঁপে প্রাণ কানায় কানায়
আকাশ-সময় যেন একমুঠো আগুনে জোনাকি,
প্রহরে প্রহরে তবু ডাক দেয় বাজবৌরী পাখি
অনন্ত কালের কানে মিছিমিছি সময় জানায়।

আকাশ-সময়ময় সময়-আকাশময় এই মহাপ্রাণের মিনার
এ প্রাণের খোঁজে ঘুরে পাইনি তো দিশা,
ঘুরেছি গাঙ্গেয়ভূমি শ্রাবস্তী-বিদিশা
যে-প্রাণ দেউলপুরে — সে-প্রাণই আমার॥

তবু

নিশুতি রাতের নেকড়ের মত দৈন্য যখন গর্জায়
তবু প্রেম এল জীবনের সিং-দরজায়
হে জীবন তুমি কী মধুর কী নিখুঁত
অপরূপ অদ্ভুত !

কোথা নীড় ? কোথা নীড় ?
নির্জন কোন্ কোণেতে দু'জন হবো যে সন্নিবিড় !
আমি নীড়-সন্ধানী
নীচে ধূসরিত পাষাণের রাজধানী
নীড় নেই হেথা নীড় নেই
উটপাখি আজ কোথায় খুঁজবে বাসা
নভ হ'তে অবতীর্ণেই,
নীড় নেই কোনো নীড় নেই।

নীড় নেই কোনো পালাবার
চলো হিমাচলে চলো যাই দূরে মালাবার,
শেষ ক'রে মিছে ছন্দমিলের গরমিল
চলো যাই চলো সাগর যেখানে ঊর্মিল,
গুঁড়োনো গিনির মতই যেখানে গুঁড়ো গুঁড়ো বালি উড়ছে
সোনা বালুচর প'ড়ে আছে কাঁচা রোদের হলুদে মূর্ছে'
জোয়ারের বাধা আনি না তো আর গ্রাহ্যে
পৃথিবীকে চলো দীর্ঘ করি সে নতুন দ্বীপের রাজ্যে।

বাসা নেই হেথা বাসা নেই
মকরকেতুকে দিতে হবে তুলে ভাসানেই,
যেদিকে তাকাও সামনে অথবা পিছনেই
শুধু নেই নেই কিছু নেই,
সবই মুছে গেছে ডুবে গেছে বিস্মরণে
তবু দেখি প্রেম এসে গেল এই জীবনের সিং-তোরণে
হে জীবন ! হে সময় !
বিস্ময় ! মধুময় !

পনেরই অগস্ট, ১৯৪৭

আমার দু'চোখে আজ করে ছলোছল
পদ্মার অজস্র জল
মেঘনার ডাক,
মেঘের স্রোতের মত স্তম্ভিত অবাক্‌।

ডাক আসে ধূসর শহরে
রুক্ষ দ্বিপ্রহরে
বাতাস ছড়ায় অবসাদ,
ছিন্নমস্তা করে শুধু্‌ রক্তের আস্বাদ।

শুক্‌নো পাতার মত উড়ে এল স্বাধীন সনদ,
এখানে আমার চোখে ঢেউ তোলে
বুক্‌জোড়া পদ্মা হ'তে দূর সিন্ধুনদ,
তবুও মুক্তির স্রোত ওঠে ফুলে' ফুলে'
করোমণ্ডলের ধারে শ্যাম মালাবার উপকূলে
ভারত-সাগর গর্জায়,
ইতিহাসে শুরু হবে নতুন পর্যায়।

এখানে তো শাঁখের করাতে
দিনগুলি কেটে যায় করাতের দাঁতে
সীমানার দাগে দাগে জমাট রক্তের দাগ —
কালনেমী করে লঙ্কাভাগ।

তবু এল স্বাধীনতা দিন
উজ্জ্বল রঙিন
প্রাণের আবেগে অস্থির —
ডাক দেয় মাতা পদ্মা, পিতা সিন্ধু-তীর ॥

মারাঠা ঘাট

উপত্যকা ফুটি-ফাটা রোদ্দুরের তাতে
পরিশ্রান্ত সমতল বেঁধে কালো দাঁতে
পাহাড়ের আরক্ত উরুর বাঁকা শিরায় শিরায়।
ঘাস-পাতা মুখে ক'রে ছাগলের পাল ফিরে যায়
আদিম পথের গ্রন্থি দিয়ে
বেঁধে রাখে পাহাড়ের চুড়ো এলোমেলো :
কালো চাষী মেরুদণ্ডে ক্লান্ত সূর্য টেনে নিয়ে এল।

ওল্‌টানো মাটির ডেলা লাল,
সূর্যদেব গুঁড়ো করে লাল মাটি সারাদিনভোর
শিব যেন বীজ বুনে গেছে এই দেশের ওপর।

এ-মাটি কি তেতেপুড়ে শুধু ম্লান হবে
ঘুঁটের আগুনে আর কম্পিত পশুর আর্তরবে ?
খুদে দেবতার দল আর পুরুতের ভিড় ঠেলে
এ-মাটির প্রাণ কবে উড়ে যাবে ঈগলের মত ডানা মেলে
পর্বত-শয্যায় সুবিশাল,
যেখানে মাটির গুঁড়ো ময়দার মত ধুলো-ধুলো —
রক্তের মত লাল-লাল।

এ-প্রাণ নিশ্চল
ব'সে ব'সে শুধু দিন গোনে,
কঠিন পাথর ভেঙে রুগ্ন কৃশ কৃষকের দল
শুক্‌নো জমির ফালি চষে, বীজ বোনে :

আর ভূমি-দেবতারা — নেই কোনো নীতি-বোধ-ন্যায়
চাষীর পঞ্জর থেকে মজ্জা শুষে নেয়।

কে যেন বন্ধুর পথ পার হ'য়ে গেল ?
বোধ হয়, বোঝা নিয়ে ভিখিরির হানা!
নক্ষত্র-পতন দেখে ককিয়ে উঠেছে কেউ ?
শুধু কোনো ভূমিহীন সৈনিকের মৃত্যুর নিশানা!

হাজার বছর শুধু ব'য়ে গেল কান্নায় অঝোর!
আবার নতুন ক'রে শুরু হবে শূন্য রিক্ত হাজার বছর ?

— অ্যালান লুইস

শেষ ক্ষমা

যখন অস্তিমগুলি হৃদপিণ্ডে বিঁধেছে সজোরে
তুমি করজোড়ে
খুনীর নিকট হ'তে পৃথিবীর কাছ হ'তে অনন্ত নিখিলে
ক্ষমা চেয়ে নিলে :
হেসেছিলে হাসি হিরণ্ময় ?
যে-হাসিতে নিশুতি প্রভাত হয়
কয়লার মত কালো অন্ধকার গ'লে পড়ে হীরক-সকালে

হাজার বছর যেন বয়ে গেল এলোমেলো লুয়ের মতন
হাওয়ার উজান ঠেলে চেয়ে ছাখো, পুরাতন
ইন্দ্রপ্রস্থ হ'তে বেথেলেম
কত না প্রাণের মরু পেরিয়ে এলেম,
চিনেছি তোমায় আমি তুমি সেইজন।
কাঁটার মুকুট প'রে দুর্জনের তরে তবু চেয়েছ মার্জনা,
এইবার জোড়হাতে
শেষ-ক্ষমা চেয়ে নিলে ঘাতকের চরম আঘাতে।

হাজার বছর ধ'রে
জীবন মরুভূ শুধু ধু-ধু করে রুক্ষ অনাদরে
হা-হা করে তপ্ত-তাম্র অগ্নির বলয়,
হঠাৎ কখন ওঠো বুদ্ধ-হিমালয়
ছেয়ে দাও করুণা-করুণ ঘন মেঘের বন্যায় —
তুমি জন্ম নাও আর মানবতা নবজন্ম নেয়॥

স্বর্ণভস্ম

ভস্ম তোমার ছড়িয়ে দিলেম
গঙ্গা সিন্ধু খরস্রোতে
নীল, অ্যামাজন, হোয়াংহোতে
ছড়িয়ে দিলেম, জড়িয়ে দিলেম
সাত সাগরের অতল জলের অন্ধকারে,
নতুন প্রাণের অঙ্গীকারে।

এই যে বিরাট পতিত জমিন্ অনুর্বর,
মনসাকাঁটা গুল্মে ভরা দিগন্তর,
শূন্য সকল সম্ভাবনা,
প্রাণধারণের প্রাণহরণের বিড়ম্বনা!

ভস্ম তোমার মিলিয়ে গেল স্রোতের তোড়ে
ননির চেয়ে নরম নতুন অবাক্ পলির সৃষ্টি ক'রে
বসুন্ধরার বন্ধ্যাচরে
এবার বুঝি জীবন-সোনার ভস্ম ঝরে :
পতিত মাটি আজ্কে দেখি স্বপ্নরতা
আসবে ফিরে হারানো তার উর্বরতা
দিগন্ত তার উঠবে জেগে
সবুজ মেঘে।

ভস্ম তোমার বীজের মতই ছড়িয়ে গেল আকাশতলে
জলেস্থলে॥

পুনর্জন্ম

আল-পথে যেতে যেতে
আশ্বিনের ফসলের ক্ষেতে
চাষীদের পিছু পিছু দূর মাঠে মাঠে
কে যে পথ হাঁটে !

ঝোপে-ঝাড়ে পোকা পাখি-পাখালির গানে
মাটি হিম শস্যের ঘ্রাণে
বাংলার মাঠে ঘাটে বাটে
আসাম বিহার গুজরাটে
পেলেম তোমার দেখা
কোটি কোটি লাঙলের ভার নিয়ে হাঁটো একা একা
তুমি ব'লেছিলে খালি —
দিল্লী নয়, চলো নোয়াখালি।

সোনালী হাসিতে প্রতিদিন
আকাশে করায় স্নান নতুন আশ্বিন
তোমার জন্মের তিথি পেল ঠিক
আশ্বিনের সেই স্নিগ্ধ হাসির ঝিলিক
যে-হাসিতে ধুলোর উপরে
পশুর কঠিন দাঁত ঠুনকো কাঁচের মত
গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝ'রে পড়ে।

এ পৃথিবী ছিল এককালে
প্রাবৃট তিমির ঘন বায়ব গর্ভের অবরোধে,

এসেছে শিশুর মত শরতের কোলে
কাঁচা-মিঠে রোদে :
অনেক বছর ধ'রে বয়ে গেল কালের কুটিল স্রোত
জরা আর মলিনতা মুছে দিল প্রথম শরৎ,
হারায়ে গিয়েছে সেই সাত্ত্বিক সকাল
আমরা পেয়েছি শুধু পৃথিবীর স্থবির কঙ্কাল :
তুমি জন্ম নিলে।
হঠাৎ আশ্চর্য আলো নরম নিবিড়
পুনর্জন্ম হ'ল পৃথিবীর ॥

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

বিশ্বের পরম বিন্দু তুমি :
তোমার সীমান্ত ছুঁয়ে কতদূরে কোন্ অদৃশ্যভূমি,
আখরোট-রুক্ষ এক ধূসর কঠিন আবরণ
অন্তরে অমৃতময় মধুর ক্ষরণ
রসঘন হ'য়ে ওঠে ব্রহ্মাণ্ড-নক্ষত্র-নীহারিকা,
তাদের চরম কেন্দ্রে একটি আশ্চর্য শিখা
কোমল করুণ অনির্ব্বাণ —
বুদ্ধের শরণ লইলাম।

নিঃসঙ্গ দ্বীপের মত আছ এক অন্তহীন মহাশূন্যতায়
তবুও তোমার লীলা পৃথিবীর ছোট ছোট প্রাণের পাতায়,
অক্ষয় অশ্বত্থ শাখা প্রসারিত দিকে দিগন্তরে
কী মন্ত্র জীবন্ত করে
কী তেজ উদ্দীপ্ত করে বহির্লোকে — কোন্ সূর্যে জানায় প্রণাম!
বুদ্ধের শরণ লইলাম।

অনেক অনেক সূর্য তোমারই উপরে ভাস্বর
উজ্জ্বল শানিত চোখ মেলে,
অবাক্ জ্যোতিষ্ক তুমি এলে :
অমর্ত্য জ্যোতিতে হ'ল পৃথিবী নশ্বর
সূর্যলোক ম্লান —
বুদ্ধের শরণ লইলাম॥

১৯৪৬ — ১৯৩৬

ভুখ-মিছিল

এই আকাশ স্তব্ধ নীল।
কোনোখানেই
যুদ্ধ নেই
হেথা আকাশ রুক্ষ নীল
নিয়ে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ-মিছিল।

এখানে নেই টুকরো দূর-দিগন্তের
জ্বলন্ত
এখানে নেই আগুন-ফুল সে-বৃন্তের
ফলন্ত
হেথা আকাশ শুষ্ক নীল
নিয়ে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ-মিছিল।

কোনোখানেই
যুদ্ধ নেই
তবু হাওয়ায় কিসের সুর
আহত আর মুমূর্ষুর
বিষণ্ণ
অন্ন নেই পণ্য নেই বিপন্ন।

আকাশে দাগ কোথাও নেই কঙ্কালের কলঙ্কের
অসংখ্যের।

খোলো নয়ন হে অন্ধ
এখানে আজ ঘোরে না সেই মহাসমর কবন্ধ ?
এই দারুণ ক্রন্দনেই
যুদ্ধ নেই ? যুদ্ধ নেই ?
তবু আকাশ স্তব্ধ নীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ-মিছিল।

১৩৫০

দীর্ঘশ্বাসের মত এরা আসে
চোখের জলের মত এরা মুছে যায়,
এরা আসে এরা যায় —
মাটির সবুজ শিরা বেদনায় হয়েছে কি নীল ?
পৃথিবী কি অশ্রুতে হয়েছে ফেনিল ?

এরা আসে
ব্যথার বাষ্পের মত ফুলে' ওঠে ঈশান আকাশে,
আসে কালো কুয়াসার মত
ম্লান অবনত,
তবু বারেবারে
চিরে যায় ছিঁড়ে যায় শানিত সূর্যের ক্ষুরধারে।

দীর্ঘশ্বাসের মত আসে,
চোখের জলের মত এরা মুছে যায়,
শিশিরের মত মোছে ঘাসের শয্যায়;
মাটির শ্যামল প্রাণ বেদনায় হ'য়েছে কঠিন ?
পৃথিবী কেঁদেছে কোনদিন ?

বন্যার হাওয়ার মত এরা হা-হা করে
দুর্ভিক্ষের ঝড়ে,
আসে মন্বন্তরে
কৃমির উল্লাস নিয়ে শবের ভিতরে :
তবু এরা আসে
এগারশো ছিয়াত্তরে — তেরশো পঞ্চাশে।

ইস্পাহান

আমি তো খুঁজছি অহর্নিশ
আমার ক্ষেতের সোনার শীষ
গেল কোথায় ?   সে কোন্‌খানে ?
ইস্পাহানে ?

ইস্পাহান তো বন্ধ্যা নয় — অবন্ধুর
প্রতি শাখায় শ্যামাঙ্কুর
লাল আপেল নীল আঙুর
সুপ্রচুর !

ইস্পাহানে
সিঁদুরে অধর নধর তন্বী নয়ন হানে,
গিনি-তরল দ্রাক্ষাসব অসাবধান
কী হবে সেখানে সোনালী ধান ?

ইস্পাহানের পীত বাদাম কী ভঙ্গুর
লাল আপেল নীল আঙুর :
তবু আমার সোনার ধান
গেল কোথায় ?   ইস্পাহান ?

দোল্না

আজকে ছোট দোল্নাখানি ঝুলিয়ে দাও
ঘুমের চামর বুলিয়ে দাও
জীবনদোলা দুলিয়ে দাও।

নীল আকাশের নীলগুলি সব নিংড়ে আনো
নতুন মেঘের সজল কালো মনভুলানো
নিংড়ে আনো
হাজার কচি করুণ চোখে মেঘের কাজল বুলিয়ে দাও
ককিয়ে-ওঠা কান্নাগুলি ভুলিয়ে দাও
আজকে ছোট দোল্নাখানি দুলিয়ে দাও।

আজকে দেশের এ-প্রান্তরে
তেপান্তরে
হাজার শত দেব্‌তা-শিশু ককিয়ে মরে
অনাবৃত অনাদৃত
জীবন্মৃত স্তূপীকৃত।

আজকে পথে নীড়-হারানো
হাজার হাজার নতুন জীবন কুড়িয়ে আনো
কুড়িয়ে আনো
হাজার কচি শুকনো চোখে মায়ার কাজল বুলিয়ে দাও
কান্নাহাসির দোল্নাখানি দুলিয়ে দাও॥

কালো আকাশ

আকাশের সঙ্গে তো কোনোদিন ছিল না বিরোধ,
এই তো পেলাম আমি সবুজ শস্যের মত অঢেল হাওয়ার স্রোত
সোনালী ধানের মত রোদ,
আকাশের সঙ্গে তো কোনোদিন হয়নি বিরোধ।

আকাশে কোথাও নেই যুদ্ধের সীমানা,
আমার আকাশ হ'তে কত যে অদ্ভুত কথা কত কি অজানা
ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসে টুপটাপ কথা কয় সব,
আমি তো তাদের চিনি তাদের করেছি অনুভব।

কবে আমি আদিগুহা হ'তে অপলকে
গুনেছি অগুন্তি তারা দূরতম লোকে,
আকাশ দিয়েছে ভাষা নতুন প্রত্যূষ
তাই তো মাটির প্রাণ হ'য়েছি মানুষ।

সে-আকাশ মুছে ফেলো
ইটের পাঁচিল তোলো গাঁথো বনিয়াদ,
সেখানে উঠেছে নাকি আগুন-গোলার মত চাঁদ
একি পরিহাস!
আজিকে আমার নয় আমার আকাশ।

ডাস্টবিন

মানুষ এবং কুত্তাতে
আজ সকলে অন্ন চাটি একসাথে,
আজকে মহাদুর্দিনে
আমরা বৃথা খাদ্য খুঁজি ডাস্টবিনে।

এই যে খুনে সভ্যতা
অনেক জনের অন্ন মেরে কয়েক জনের ভব্যতা,
এগোয় নাকো পেছোয় নাকো অচল গতি ত্রিশঙ্কুর —
হোটেলখানার পাশেই এরা বানিয়ে চলে আঁস্তাকুড়।

আজ যে পথে আবর্জনার স্বৈরিতা
মহাপ্রভু! সবই তোমার তৈরি তা।
দেখছি বসে দূরবীনে
তোমায় শেষে আসতে হবে তোমার গড়া ডাস্টবিনে।

১৯৪২

শেষ হ'ল সাম যজু অথর্ব ঋক্
হাঁক দেয় ওই কালের দৌবারিক,
শেষপাতা শেষ হ'ল
হে নাবিক, পাল তোলো !

চেয়ে ছাখো কত যোজন দীর্ঘ প'ড়ে আছে আড়াআড়ি
চল্লিশ কোটি জীবনের বালিয়াড়ি,
অগ্নি-তামাটে প্রখর সৌরকরে
বালি আর কঙ্করে :
এই বালুময় সময়ের সৈকতও
তোমার চরণ-চিহ্নেও সে তো র'য়ে গেল অক্ষত !

আরবের মরু উচ্ছল হ'ল মামুদের গজ্নীতে
তারি ঢেউ লাগে খাইবার গিরিবর্ত্মের ধমনীতে,
আজো নিশ্বাসে মেশা
চেংগিস খাঁর শানিত অশ্বহ্রেষা,
গুজরাটে কর্ণাটে
খোঁড়া তৈমুর হাঁটে।

তোমার ঝর্ণা আমার প্রাণের গঙ্গায় মেশেনি তো
শ্বেত-গৈরিকে হয় নাই চিহ্নিত,
ভারত-সাগর হ'তে দেখি আমি দূরতম প্যাসিফিকে
তোমার নেহাই আলো দেয়নিকো, তাপ দিল দিকে দিকে,
দূর বোর্ণিও মালয় যবদ্বীপ —
জ্বলেনি কোথাও তোমার জীবন-দীপ।

তুমি তো আঁকোনি ইতিহাস-পাড়ে প্রাণের স্বর্ণজরি
গড়োনি কখনো নিটোল ভৌগোলিক,
নতুন দ্বীপের পুঞ্জে জাগেনি নারিকেল-মঞ্জরী,
প্রাণের মাঙ্গলিক :
হে নাবিক, হে নাবিক
পাল তোলো, পাল তোলো,
শেষ পাতা শেষ হ'ল !

কেরানী

দেয়াল-পাঁজির পাতায় পাতায়
দিন ছিঁড়ে যায় বিষণ্নতায়
দিন উড়ে যায় হাওয়ায় হাওয়ায়
হায় !

আপিস-বেলায়
চল্‌তি ট্রামের খোলা জানলায়
দেখি ময়দান নীল নিরালায়
রোদের মিষ্টি আগুন পোহায়,
আমি অসহায়
আমায় এখন যেতে হবে কোন্ ইঁটের গুহায়।

আবার কখনো ফিকে কুয়াসায় আকাশ ছাপায়
গাছগুলি দূরে ভিড় করে ছোট পাহাড়ের প্রায়
মাঠের উপরে মোষগুলি চরে হেথায় সেথায়
এলেম কোথায় ?
সাঁওতালী পাড়া — পাথর পাড়ায় ?
এলেম কোথায় ?
মনে হয় কোন্ পাহাড়-চূড়ায় —
মনের কোনায়
ছন্দ ঘনায়।

তারপরে সেই শিশু-কবিতায়
পিষে দিয়ে যাই লেজার-খাতায়

লেজার-খাতায়

কাজের জাঁতায় :

এমনি করেই দিন ছিঁড়ে যায় নৃশংসতায়

দেয়াল-পাঁজির পাতায় পাতায়

দিন উড়ে যায় হাওয়ায় হাওয়ায়

হায় !

ব্যাঙ্ক

সারাদিন পরে স্বর্ণসিংহ লৌহগুহায় ঢোকে
ক্লান্ত লেজার আসিছে বন্ধ হ'য়ে,
বাইরে এখন বৈকালী ঝড়ে অজস্র সোনা ওড়ে
সোনালী বিকেল স্বর্ণের সমারোহে।

বাহির পৃথিবী আমাদের আর হানেনা তো ইঙ্গিত
বণিক-যুগের আমরা পাহারাদার,
প্রতিদিনকার সূর্য গড়ায় তপ্ত চায়ের কাপে
এক পেয়ালাতে দিন হয় গুলজার।

এই বৈকালে গঙ্গার কোলে স্বর্ণমৃগেরা চরে
সোনার হরিণ সুবর্ণ-ঝরনায়,
বৈশ্যযুগের নিকটে ওরা তো নিছক অবান্তর,
অনাদরে সেই স্বর্ণাভ স্রোত সীসা হয় বেদনায়।

খুদে কেরানীর অবাধ্য অন্তর
ভাবে কতদিন বেনে-দুনিয়ার উদ্ধত পোদ্দারি,
জীবন্ত সোনা ডুবিছে এখন বড়গঙ্গার জলে
আর কতকাল মৃত-স্বর্ণের এমনি পাহারাদারি!

নতুন মানুষের গান

নতুন মানুষ তোমরা কারা ?
তোমরা এলে ছন্নছাড়া।
পাথর-পাতা সড়ক ধ'রে
কখন এলে লালচে ভোরে
রক্তপথের সঙ্গী হবার দাও ইসারা
তোমরা কারা ?

আমরা জানি ইতিকথায় রাজার কথা,
রাজ্য-ওঠার রাজ্য-নামার প্রগল্‌ভতা।
ইতিহাসের পাথর ঠেলে
কেমন ক'রে তোমরা এলে
চৌদিকে যার ঐতিহাসিক দেয় পাহারা
তোমরা কারা ?

গোলামখানা

মাসকাবারী দেনায় টিকি বিক্রি
বাস্তুভিটে ডিক্রি,
তবু তো এই গোলামগিরি ভাবছি পরমার্থ
কায়েম করি মহাপ্রভুর স্বার্থ।

ওপর হ'তে হুকুম করে যক্ষ
যজ্ঞশালায় চাই যে আরো তৈল,
খনির বুকে শিকড়-বেঁধা সবার হ'ল লক্ষ্য
মানুষ-গলা চর্বি যেথা রইল।

আমরা আছি, তাই তো চাকা চলছে
স্বৈরাচারের তাই তো চুলি জ্বলছে,
আমরা যেন সলতে
আমরা শুধু জ্বলতে জানি, জানি কেবল গলতে।

গোলাম দেশের বাচ্চা সবাই গোলাম ঘরের রক্ত
গোলামিতেই আমরা অভিশপ্ত,
এমনি ক'রেই কোনক্রমে ভাঙিয়ে শেষ-রেস্ত
গোলামখানার গোলাম বলে, আমরা আছি বেশ তো।

যুদ্ধ

যুদ্ধের এই রীতি
এতো কিছু নয়, ক্ষ্যাপা পৃথিবীর সাময়িক বিকৃতি,
এ যেন হঠাৎ বন্যার তোড়ে সারাগ্রামে হাহাকার
ঘুমন্ত কোন্ পল্লীর নীড়ে ঘূর্ণির হুঙ্কার :
কোন্ অরণ্যে সহসা অগ্নিশিখা
শকুনির মত ওড়ে কোথা যেন মড়কের বিভীষিকা :
এই তো যুদ্ধ-রীতি
বারেবারে এই ক্ষ্যাপা পৃথিবীর ক্ষ্যাপামির পরিচিতি।

আমি তো দেখেছি পৃথিবীর এই সবুজ আস্তরণ
ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে কত যুদ্ধের অশ্বের ক্ষুরে ক্ষুরে,
আবার কখন অজান্তে লাগে জীবনের কাঁচা রং
পোড়ামাটিগুলি কখন মেলায় সবুজের অঙ্কুরে,
কত আশ্বিন ডুবে গেছে জানি দুঃখের প্যাসিফিকে
মরণের আহ্বানে,
হারানো শরৎ আবার এসেছে ভ'রেছে চতুর্দিকে
মাটির হিমের শস্যের আঘ্রাণে।

এ-নরম মাটি কতবার দেখি চিড় খেল অবিরত
প্রাণের মাখনে আবার জুড়েছে মৃত্যুর সব ক্ষত,
এই তো যুদ্ধ-রীতি—
শতকে শতকে ক্ষ্যাপা পৃথিবীর ক্ষ্যাপামির স্বীকৃতি।

ব্যাঘ্র-দিন

সোঁদরবন !
আমার শ্যামল শিরায় বহিছে সারাক্ষণ
সোঁদরবন !
সোঁদরবনের আত্মা আমার রাত্রিদিন
খুঁজছে কোথায় ব্যাঘ্র-দিন,
যেথা নখর
তীক্ষ্ণ থাবায় ভয়ঙ্কর,
বর্শা-ফলকে
পলকে পলকে
জীবন-মৃত্যু সম্মুখীন
হারাল কোথায় ব্যাঘ্র-দিন ?

ওই যে পৃথিবী চক্রবালে
সভ্য-সূর্য অন্তরালে
কৃষ্ণকায়
সুদূর মেহুর আফ্রিকায়
তারা কি এখন অন্তরীণ
আমাদের সেই ব্যাঘ্র-দিন ?

সেই পুরাতন দিনগুলি আজ নির্বাসিত
শৃঙ্খলিত
দুর্বিপাকে
তাকিয়ে থাকে
ফাঁক পেলে তারা ছিঁড়বে রুগ্ন সভ্যতাকে,

আফ্রিকারি জাফ্রি-ফাঁকে
তাকিয়ে থাকে।

অনন্তকাল রইবে না কেউ অন্তরীণ
তাই তো সভ্য-জগতে ঘনাল কী-দুর্দিন।
আবার তারা যে করবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ
শঙ্কাহীন
সেই পুরাতন ব্যাঘ্র-দিন!

আগামী

পৃথিবী উন্মাদ হ'ল : ঘূর্ণ্যমান বিমানের উদ্যত পাখায়
সূর্যের উজ্জ্বল মুখ ম্লান হয়ে যায়,
কামানের জ্বলন্ত নিশ্বাসে
বাঁচিবার স্বচ্ছ বায়ু বিষ হয়ে আসে।
পৃথিবী উন্মাদ হ'ল : অসংখ্য বোমার ভারে
কত প্রাণ নিষ্পেষিত হয়েছে নিঃসাড়ে,
কত ভাঙা সমাধির হ'ল যে রচনা
যেখানে কবর হ'ল লক্ষ লক্ষ মানুষের যুগান্ত সাধনা।

এ-দিন রবে না জানি উদ্ধত অটল
আমি যে দেখেছি এই শতাব্দীর মেরুদণ্ডে ধরেছে ফাটল,
স্থাপিত নিয়মতন্ত্র কোথা যেন হয়েছে বিকল
অচঞ্চল ছিল যাহা আজ তাহা হয়েছে চঞ্চল,
স্থির আজ হয়েছে অস্থির,
পুরোনো পৃথিবী তাই স্বপ্ন দেখে নতুন পৃথ্বীর,
তাই তো নামিবে ভোর
পৃথিবীর ভগ্ন এই স্তূপের ওপর,
এবার নামিবে ভোর — নতুন সকাল
জানি জানি ভোর হবে কাল।

আগামী মানুষ আর মিলিবে না মানুষের সাথে
অরণ্য-পাখির মত সাদা-কালো-হলুদের রঙের পাখাতে,
মানুষের পরিচয় হবে মানুষতা
শেষ হবে এই মূঢ় বন্য-শকুনতা :

আগামী পৃথিবী আর র'বে না খণ্ডিত হ'য়ে
সমুদ্র ও পাহাড়ের সীমান্ত-রেখায়,
নিঃসঙ্গ দ্বীপের মত ছিন্ন অসহায়,
হবে তার সীমার বিস্তার —
এক মহাদেশ আর এক পরিবার।

সেদিনের প্রশান্ত বাতাসে আর বিঁধিবে না বুলেটের শর
ধ্যানস্থ আকাশ আর হবেনাকো সচকিত মৃত্যুতে মুখর,
জানি জানি আগামী কালের জেপেলিন
নিষ্ঠুর শেলের ঘায়ে করিবে না পৃথিবী বিলীন,
রুপালী মাছির মত উড়ে যাবে দূর গ্রহপানে
নতুন পৃথিবী অভিযানে,
মঙ্গল গ্রহের অন্তঃপুর —
সেদিন র'বে না বহুদূর !

কাস্তে

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু,
শেল্ আর বম্ হ'ক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু !

বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে ?
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ-যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে !

লোহা আর ইস্পাতে দুনিয়া
যারা আজ করেছিল পূর্ণ,
কামানে কামানে ঠোকাঠুকিতে
নিজেরাই চূর্ণ-বিচূর্ণ ।

চূর্ণ এ লৌহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে
ক্ষয়িত গলিত হয় মাটিতে,
মাটির — মাটির যুগ ঊর্ধ্বে ।

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই, চেয়ে দেখ বন্ধু,
কাস্তেটা রেখেছ কি শানায়ে
এ-মাটির কাস্তেটা বন্ধু !

সিন্ধুবাদ

সিন্ধু-নাবিক নহিকো আমরা কেউ
নোঙরবন্দী জাহাজ নাহি তো বন্দরে বন্দরে,
আমাদের কূলে ভাঙেনি আজিও দ্বীপান্তরের ঢেউ
পাল মেলি নাই কখনো কোথাও অজ্ঞাত বালুচরে।

আমরা নহি তো সমুদ্র-উন্মনা
সাগর-সারসী ছোঁয়নি কখনো আমাদের মাস্তুল,
আমাদের ঘিরে হয়নি রচিত আরব্য-কল্পনা
রহস্যময় নতুন দ্বীপের অদ্ভুত উপকূল।

আমরা কেহই নহি তো সিন্ধুবাদ,
নদী খাল-বিলে বন্দী রয়েছে পুরাতন অন্তর,
আমাদের ডিঙি জানে দারিদ্র্য দৈন্যের সংঘাত
জানে না কোথায় ঝলসিত বন্দর।

আমরা রয়েছি শত শতকের পাথরের চাপে চাপে
ধাপে ধাপে রচা লাঞ্ছিত কত জীবনের ছিনিমিনি,
কত না রাজ্য এল আমাদের রক্তের উত্তাপে
সঞ্চিত হ'ল কত ব্যাবিলন কত না উজ্জয়িনী।

সিন্ধুবাদের মত আমাদের নাহি তো চঞ্চলতা
নাই বা রহিল ময়ূরপঙ্খি বহুদূর বন্দরে,
আমাদের ঘিরে নাই লেখা হ'ল আরব্য-উপকথা,
আমাদের নাম তবু আছে দেখো পৃথিবীর প্রস্তরে।

এরোপ্লেন

এরোপ্লেন ! সুদূর আকাশে ভাসমান
দুরন্ত গতির ঝড়ে ধোঁয়া-মেঘ করে খান্ খান্,
নীচে নীল অরণ্য-ছায়ায়
ভোরের স্বপ্নের মত ঈশ্বরের পৃথিবী ঘুমায়।

এরোপ্লেন উড়িছে আকাশে,
ভ্রমরের মত তার রুপালী গুঞ্জন ভেসে আসে
রুপালী ভ্রমর যেন। ভ্রমর ? ভ্রমর কোথা ? মেসিন ! মেসিন !
এ-মেসিন উড়ে যাবে কত রাত্রিদিন
কত না শহর ছুঁতে ছুঁতে,
কত না এসিয়া ছুঁয়ে কত না আকাশ ছুঁয়ে মেরুতে মেরুতে,
ফেলে যাবে অগণিত বোমা কত টন
কত বিস্ফোরণ
গ্যাস আর বিষাক্ত আগুন
জ্ব'লে যাবে কত তপ্ত শ্বাস আর কান্না সকরুণ !

মানুষের মেসিন উড়িছে —
ঈশ্বরের স্বপ্ন কাঁপে নীচে।

ভাঙা চাঁদ

আকাশে করুণ ভাঙা চাঁদ
আকাশে ধোঁয়ার ফাঁকে পশ্চিমের ম'রে-যাওয়া চাঁদ :
ফ্যাকাসে চাঁদের এই ঘোলাটে আলোয়
সকলই কেমন যেন ভাঙা-ভাঙা লাগে।
মনে হয় ভেঙে গেছে টাওয়ার হাউস
ভেঙে গেছে মনুমেণ্ট গির্জের চুড়ো
ভাঙাচোরা গোটা পৃথিবীটা।

নতুন কুয়াসা ওড়ে :
পাণ্ডুর চাঁদের এই পাঁশুটে আলোয়
মনে হয়
কুয়াসা—কুয়াসা নয়
ওড়ে যেন ছাইয়ের গুঁড়ো,
ছাই আর ছাই—
ভিস্যুভিয়সের যেন মুখ গেছে খুলে
ছাই দিয়ে ঢেকে যায় সারা পম্পাই !

নিসাড় নিষুতি রাত :
বেদনার হিমে-ভেজা তারাদের ছলছল চোখ,
তার নীচে
ইডেন গার্ডেন হ'তে ভেসে আসে চাপা কান্না বাদুড়শিশুর,
গড়ের মাঠের কোণে একপাল পোকার গোঙানি,
আর গ্র্যাণ্ডহোটেলের ধারে
কাৎরায় আধমরা পথের কুকুর।

এই ভাঙা আলো আর কুয়াসার ছাই আর করুণ কান্নায়,
মনে হয় সারা পৃথিবীটা
সবেমাত্র মৃত সেই পম্পায়ের স্তূপ,
তার মাঝে দাঁড়ায়ে রয়েছি আমি
সুদূর নিঃসঙ্গ এক প্রেতের মতন !

মাইকেল

মোটরে ঝড়ের বেগ
ঝড়ের মতই কালো এলোমেলো রাত,
চক্‌চকে আলো জ্বলে হেড্‌লাইটের —
তারি তলে ছুটে চলে যশোহর রোড।

মোটরে অনেক দূর :
অগুন্তি গাছের ফাঁকে নিবিড় শাখার নীচে
সুড়ঙ্গের মত
যশোর রোডের সঞ্চরণ।
সুদূর সুড়ঙ্গ চলে
সবুজের ভিড় ঠেলে
ভিড় ঠেলে কত ডাঙা, ভাঙাবাড়ি, ভাঙাগ্রাম
পিছনে অনেক গ্রাম, কত বন, বনগ্রাম
পিছে ফেলে ইছামতী তীর।

মোটরে অনেক দূর
অনেক — অনেক দূর
আবার অদূরে কোন্ গহন জলের ছলোছল !
কপোতাক্ষ ?
কপোতাক্ষ কতদূর !
সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে —
কপোতাক্ষ আর কতদূর !

মৌমাছি

জীবন্ত ফুলের ঘ্রাণে
দুপুরের মিহি স্বপ্ন ছিঁড়েখুঁড়ে গেল :
জেগে দেখি আমি,
এসেছে আমার ঘরে ছোট এক বুনো মৌমাছি,
ডানায় ডানায় যার অরণ্য-ফুলের কাঁচা ঘ্রাণ
পাঁশুটে শরীরে যার সোঁদাগন্ধ অজানা বনের।

কেমন সুন্দর ওই উড়ন্ত মৌমাছি !
অশ্রান্ত করুণ ওর গুনগুনানিতে
কেঁপে ওঠে মাটির মসৃণতম গান,
আর দূর-পাহাড়ের বন্ধুর বিষণ্ণ প্রতিধ্বনি !
যেন আজ বাহিরের সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত আকাশ
আমার ঘরের মাঝে তুলে নিয়ে এল
কোথাকার ছোট্ট এক বুনো মৌমাছি !

নখ

কার্জন পার্কে বিদেশী মেয়েটি আছে ব'সে
যেন ডেজি ফুটেছে বাংলার মাটিতে।
কী মসৃণ ! কী দীর্ঘ ওর নখের পাপড়ি
যেন পড়ন্ত রোদের তামাটে তার !

ওপেল পাথরের মত স্বচ্ছ ওই নখের ওপর
ভাস্‌ছে কোন্‌ পাথর-যুগের ছায়া,
যখন বন্য মানুষ ছুঁচলো নখে
ছিঁড়ে ফেলত তার শিকারের টুঁটি।

সেই আদিম হিংসার ছোপে
আজো যেন লাল হ'য়ে আছে
ওই সুন্দর ধারালো নখগুলো !
তাই তো ওই নধর নখে
ছিঁড়ে গেছে কত তরুণের বুক,
বুঝি আমারও হৃদ্‌পিণ্ডে
ওই নখের ডগা গিঁথে যাবে !

সবুজ দ্বীপ

দূরের ওই সবুজ দ্বীপ
যেন ফিকে কাঁচপোকার টিপ্
কার মসৃণ ললাটে !
যেন ঝলমলিয়ে ওঠে
রাতের তারার মত সবুজ অস্থিরতায়,
কী সুন্দর ওই ছোট্ট সবুজ দ্বীপটি !

সাবানের ফেনার মত ছোটবড় ঢেউগুলি
হাজার হাজার ভঙ্গিমায়
ভেঙে পড়ে ওর নিটোল দেহে,
কী মধুর ওই ফেনার পালক-মোড়া সবুজ দ্বীপটি

আমি যদি ওই ঢেউয়ের মতই
চুপেচুপে ভেঙে যেতাম তোমার দেহে
অস্ফুট গুঞ্জনে
সারাদিন — সারারাত —
আর তুমি যদি ওই নির্জন সবুজ দ্বীপ হ'তে !

হাই

তোমার হাই উঠল
রাত্রি তবে কি অনেক ?
সারা ঘরে হালকা অন্ধকার
আমরা দু'জন টেবিল-আলোর নীচে
যেন অন্ধকার-সমুদ্রে কোন্ আলোর দ্বীপে বন্দী !

সোফার ভিতরে ডুবে-যাওয়া তোমার শরীর
সান্ধ্য-কুলায় ডানামোড়া পাখির মত স্বপ্নময়।
তোমার হাই উঠছে
তোমার চোখেমুখে রাত্রি নামছে,
রাত্রি অনেক !

আবার তুমি হাই তুললে
এবার তুমি সারসীর মত ডানা মেলে দিলে,
আর তোমার পালকে জড়ান কত ঘুম
সহসা ঘরের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ল,
সারা ঘরে ঘুমের রেশমী সঞ্চরণ :
আমারও ঘুম পায় !